সর্বজনীনতার নিপুণ ব্যবহারঃ ২০২৩-এ রায়ের চলচ্চিত্রের পুনর্বিবেচনা

নীলশ্রী বিশ্বাস

২ জানুয়ারি, ২০২৩

১৯৯২ সালে, অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পরিষদের অনুরোধে, চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক রিচার্ড শিকেল ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির অংশবিশেষ নিয়ে মন্তাজ তৈরি করেন। আমেরিকার হাতে রায়ের কোনও ছবির একটিমাত্রও ফুটেজ না থাকায়, শিকেল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ও চ্যানেল ৪ এর কাছ থেকে সেগুলি চাইতে বাধ্য হন।

রায়ের কাজ কি "এক বিগতকালের ধ্বংসাবশেষ" যার শ্রেষ্ঠ সময় ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত নাকি, যে সর্বজনীনতা রায়ের চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্র চিহ্নক হিসেবে উপস্থিত, এই সময়ে তাঁর পুনরাবৃত্তি অসম্ভব?

হয়ত দ্বিতীয় অনুমানটিই সত্য। ১৯৯০-এর দশক নাগাদই রায়ের ছবিগুলি পশ্চিমি দুনিয়ায় দেখান প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মার্কিন লেখক ও চলচ্চিত্র সমালোচক বার্ট কার্ডুলোর মতে রায়ের ছবিতে নিহিত মানবিকতাই তাঁর অনিষ্ট করেছে। "চেখভের মতই, রায় কোনও চরিত্র বা মতাদর্শের পক্ষ নেন না, কারণ তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকে মানবের জটিল সত্ত্বার উপর," তিনি বলেন। "তাঁর কাজে কোন নায়ক বা খলনায়ক নেই, বিজয়ী ও পরাজিতের সহজ সরল বিভাজনও নেই।"

রায়ের নায়করা এমন কেন্দ্রীয় চরিত্র মূর্ত করেন যাদের নিজেদের স্থানিক বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং তার পাশাপাশি, তাঁদের "মানবিক বুনিয়াদ" বহন করার স্বেচ্ছা প্রণোদনা রয়েছে যা "সমস্ত সাংস্কৃতিক পার্থক্যের" অতিরিক্ত এক জায়গায় চলে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, রায়ের ছবিগুলিতে আবার মানুষের অবস্থা এবং তার ভাবাবেগ উঠে আসে "প্রাত্যাহিকতা" বা জীবনের অ-নাটকীয় দিকগুলি থেকে। এই আপাত বৈপরীত্যমূলক পর্যবেক্ষণের মধ্যেই, রায় তাঁর ছবির আখ্যানের টানাপোড়েন নির্মাণ করেন দাম্পত্য সম্পর্ক ও রাজনৈতিক – এই দুটি প্রাথমিক উপাদানের মাধ্যমে।

বিষয় দাম্পত্য

অপুর সংসার (দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অপু, ১৯৫৯) ছবিতে আদর্শবাদী অপু ভাগ্যের পরিহাসে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, যখন মনোনীত পাত্রের মানসিক সমস্যা বিয়ের দিনই ধরা পড়ে। দাম্পত্য জীবনের জন্য অপ্রস্তুত অপু, বন্ধুর তুতো বোন অপর্ণাকে বিয়ে করে। প্রথমদিকে একে অপরের কাছে অপরিচিত হলেও, খুব শীঘ্রই তাদের মধ্যে তৈরি হয় আবেগের বন্ধন। পারস্পরিক ভালবাসা এবং বিবাহিত জীবনের আনন্দ এমন এক পরিবর্তন আনে যা অন্যান্য সদ্য বিবাহিত দম্পতির সাধারণ প্রেমকে অতিক্রম করে যায়।

ছবিটিতে, রায় প্রেমের ধারণাকে পুনরুজ্জীবনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন; যা অপুর জীবন সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর। তিনি বিবাহকে দুই কমরেড-এর সাহচর্য ও পরস্পরের প্রতি অবলম্বনের ভিত্তি হিসেবে দেখান। তাঁর চলচ্চিত্রের অত্যুচ্চ ভাষায়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ অনুভুতি মুদ্রিত হয় চোরা দৃষ্টি আর শরীরের সূক্ষ্ম চলনে। এই যে পন্থাটি *দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অপু* ছবিতে রায় উদ্ভাবন করেন, তা তাঁর পরবর্তী ছবি *দেবী*তেও ব্যবহৃত হয়।

দেবী (দ্য গডেস, ১৯৬০) ছবিটির বিষয় একজন গোঁড়া শ্বশুরের বিশ্বাস যে, তাঁর ছোট পুত্রবধূ মা কালীর অবতার। এই ছবির আখ্যান ঔপনিবেশিক বাংলার অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। নবীন দম্পতি দয়াময়ী আর উমাপ্রসাদের কাহিনী, যা শুরু হয় তাদের পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার মুহূর্তগুলি দিয়ে এবং যার পরেই আসে বিয়োগান্তক ঘটনাবলী, তা ধরা পড়েছে রায়ের মর্মভেদী সিনেমাটোগ্রাফির মধ্যে দিয়ে। ছবিটি শুরু হয়, তার স্বামীকে পড়াশুনোর কারণে কলকাতা ফিরতে হবে বলে সতের বছরের দয়াময়ীর বিরহ দিয়ে। ক্যামেরা তাদের ধরেছে এমন সময়, যখন তারা একটি সুসজ্জিত খাটের উপর শুয়ে আছে। উমাপ্রসাদ দয়াময়ীকে দেখছে, কিন্তু কেউ কারো চোখে চোখ রাখছে না – একটি "মুহূর্তের দৃষ্টিপাত" কৌশল, যা দর্শককে চরিত্রদুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য রায় ব্যবহার করেন।

পরে, একটি জরুরী চিঠি পেয়ে উমাপ্রসাদ বাড়ি ফিরেছে – এই গভীরভাবে পীড়াদায়ক দৃশ্যে, তাদের সম্পর্কের চরম সীমায় পৌঁছনোর ঘটনাটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই একই উপায় উল্টোভাবে ব্যবহার করা হয়। উমাপ্রসাদ যখন তাদের বাড়ির সুবিশাল আঙ্গিনায় পা রাখে, অনেকটা দূরে বসে দয়াময়ী, যার পরিচয় এখন দেবী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বামীর চোখে চোখ রাখে। উদাসীন হাসি মুখে, তার চোখ থেকে এক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ে, যা তার বিভ্রান্তি, মস্তিষ্কের বিকার এবং অসহায় অবস্থাকে চিত্রিত করে। উমাপ্রসাদ অনেক চেষ্টা করে দয়াময়ীকে দেবী হিসেবে তার নতুন জীবনের উন্মত্ততাকে বোঝাতে, কিন্তু দয়াময়ী তা বুঝতে অস্বীকার করে। *দেবী* ছবিটির পথচ্যুত দাম্পত্যজীবন এবং একদা হৃদয়বান একটি সম্পর্কের ভাঙন একটি সাধারণ বিবাহের সুখী প্রকৃতি এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাবীর বিষয়ে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে আনে।

*দেবী*তে যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে, *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবিটি, যা ছিল রায়ের প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্য, তাতে শ্রেণী ও সামাজিক সুরক্ষার মত বিষয়ের মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে আরও গভীরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *কাঞ্চনজঙ্ঘা*তে তিনটি বিভিন্ন বয়সের দম্পতি দার্জিলিঙে ছুটি কাটানর সময় জীবন, বিবাহ, প্রেম ও আনুগত্যহীনতা নিয়ে চিন্তা ও আলোচনা করেন। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই চরিত্রগুলির বাবা ও মা রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও লাবণ্য, তাঁদের উনিশ বছরের লাজুক মেয়ে মনীষা ও বড় মেয়ে অনিমা আর তার স্বামী শঙ্কর (যাদের বিয়ে প্রায় ভেঙে পড়ছে), উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইঞ্জিনিয়ার ও মনীষার প্রণয়াকাঙ্খী মুখার্জি এবং অসুস্থ মামার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সফরসঙ্গী অশোক, একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত বেকার ব্যক্তি। কাহিনী এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মনীষা জীবনে প্রথমবার তার মনের কথা খুলে বলে। সে নিজের সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানকে খোলাখুলি অস্বীকার করে ও দেখান হয় যে, সে মুখার্জি নয়, বরং স্পষ্টতই অশোকের প্রতি আগ্রহী।

দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অপু ছবিটিতে যেমন দেখিয়েছেন, মনীষা আর অশোকের মধ্যে বাড়তে থাকা আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে রায় আবারও "সহজাত" ভালবাসার ধারণায় ফিরে গেছেন। *কাঞ্চনজঙ্ঘায়* ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে, এই ছবির নির্মাতা একটি গতানুগতিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে "পারস্পরিক নির্ভরতার" ধারণাটিকে উপস্থিত করেছেন। অনিমা ও শঙ্করের মধ্যে একটি উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃশ্যে, শঙ্কর তার স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক

নিয়ে মন্তব্য করলেও, পরস্পরের উপর একটি গভীর নির্ভরশীলতার কারণে তারা একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আপসে আসতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদের বদলে, বরং তারা তাদের মেয়ের চাহিদাকে, অর্থাৎ বাবা-মা হিসেবে নিজেদের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেয়।

রায়ের চলচ্চিত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে তার ভিত্তির বুনন হিসেবে ধরে, দাম্পত্য সম্পর্কের ধারণাটি তার চরম পরিণতিতে পৌঁছায় *মহানগর* (*দ্য বিগ সিটি*, ১৯৬৩) ছবিতে। কঠিন বাস্তবের ধাক্কায় মধ্যবিত্ত দম্পতি সুব্রত এবং আরতির জীবন তছনছ হয়ে যায়। প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কের প্রয়োজন না থাকলেও, হৃদয়গ্রাহী ও মানবিক সম্পর্কের ছাঁচটিকে পুনরাধিকারের জন্য, রায় পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে তাঁর ছবির আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি পন্থা হিসেবে ধরে রাখেন। ছবিতে সুব্রতর ব্যাঙ্ক রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেলে, আরতি, একজন গৃহবধূ, সেলসগার্লের চাকরি নিতে বাধ্য হয়।

আরতি তার বিশাল পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় এবং তার প্রতিদানে, সুব্রত স্ত্রীকে চাকরির আবেদনপত্র পাঠাতে সাহায্য করে। ছবিটির শেষে আরতিরও চাকরি চলে যায়, কিন্তু তারপরেও তারা দুজনে মিলে একটি ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখে। জীবন নিয়ে তাদের আশাবাদের মধ্যে দিয়ে, রায় দাম্পত্য প্রেমকে কাহিনীর অভ্যন্তরে ফিরিয়ে আনেন। এর পর থেকে, আখ্যানের বিষয় হিসেবে "দাম্পত্য সম্পর্ক" পুনর্বিন্যস্ত হয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিই তাঁর ছবির মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

বিষয় রাজনৈতিক

রায় তাঁর জীবনীকার অ্যান্ড্রু রবিনসনকে বলেন, "আপনি একজন চলচ্চিত্র-নির্মাতা হলে, আপনার পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং আরও অনেক কিছু মিলেই আপনার সামাজিক বাতাবরণটি তৈরি হয় – যা ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ১৯৬০-এর পর থেকেই, আমি আমার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আরও বেশি করে সচেতন হয়ে পড়েছি।" বেকারত্ব, ৭০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এক দুর্ভাগা জনতার দুর্দশার মত বিষয়সহ সামাজিক বাতাবরণ রায়ের কাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে ওঠে, যার ফলশ্রুতি দ্য ক্যালকাটা ট্রিলজি – তাঁর সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক ছবিগুলির সংগ্রহ – প্রতিদ্বন্দ্বী (দ্য অ্যাডভার্সারি, ১৯৭০), সীমাবদ্ধ (দ্য কোম্পানি লিমিটেড, ১৯৭১) এবং জন অরণ্য (দ্য মিডলম্যান, ১৯৭৫)।

এই ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে, রায় এমন এক চলচ্চিত্রকারে পরিণত হন, যিনি শুধুই একজন বহুদূরবর্তী পর্যবেক্ষক নন, বরং যাঁর দৃষ্টি এখন ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর চরিত্রদের অনুসন্ধান করে। তাঁর শট ডিভিশানের ধরন বদলে যায়, অনেক বেশি সংখ্যক মিড শট এবং ক্লোজ-আপের ব্যবহার দেখা যায় এই সময় এবং অপরিসর বসতবাড়ি ও অফিস আর সংকীর্ণ অলিগলি তাঁর শুটিঙের মুখ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

দ্য অ্যাডভার্সারি ছবিতে রায় একটি নতুন দৃশ্য-ভাষায় আরোহণ করেন। তিনি অতীতকে চিত্রিত করার জন্য ফোটো নেগেটিভ ব্যবহার করেন এবং সমস্ত ছবি জুড়েই নিবিড় ক্লোজ-আপের দৃশ্যকে ছবির নান্দনিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। সংলাপের আকস্মিক উচ্চারণ এই চিত্রায়নের সঙ্গে সাযুজ্য তৈরি করে ও সিদ্ধার্থ নামের এক বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে বাকি পৃথিবীর ছিন্ন সংযোগকে ফুটিয়ে তোলে। বিধবা মা, বিপ্লবী ভাই ও উন্নততর জীবনের জন্য অভিলাষী বোনের সঙ্গে একটি অপরিসর ভাড়াবাড়িতে বাস করা সিদ্ধার্থকে ব্যক্তির আকাঙ্খা ও প্রচণ্ড দুর্নীতির মধ্যে এক বৈপরীত্য হিসেবে দেখান হয়েছে।

যদিও সিদ্ধার্থ চরম হতাশায় নিমজ্জনমান, রায় অত্যন্ত মানবিকভাবে তাঁর নায়ককে চিত্রিত করেন। ছবির মাঝামাঝি একটি ওজস্বী দৃশ্যে, কলকাতার প্রবল গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখার সুবিধা ছাড়াই অন্যান্য বেকার যুবক যখন চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য ভীড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেন তখন, প্রাথমিকতম সুযোগ সুবিধার অভাব নিয়ে সিদ্ধার্থের হঠাৎ বিস্ফোরণ অত্যন্ত মর্মভেদী।

এই শহর, যাকে *দ্য অ্যাডভার্সারি* ছবিতে খামখেয়ালী বা এক ছিন্নবিছিন্ন অস্তিত্ব হিসেবে দেখান হয়েছে, তা *জন অরণ্য* (দ্য মিডলম্যান, ১৯৭৫), ক্যালকাটা ট্রিলজির শেষতম ছবিতে আরও বর্ণহীন হয়ে ওঠে। "*দ্য মিডলম্যান* আমার তৈরি একমাত্র বিবর্ণ ও নিরানন্দ ছবি। সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না," ১৯৮২ সালে সিনিএস্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে রায় বলেন। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র সোমনাথ মুখার্জী চাকরি খুঁজে বেড়ায়। এই সময়ই তার সঙ্গে দেখা হয় সোমনাথের মতই আরেক ফুটবলপ্রেমী বিষ্ণু দার সঙ্গে। তাঁরই উৎসাহে সে একটি স্টার্টআপ উদ্যোগ শুরু করে। খুব দ্রুত সোমনাথ একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়ায়, যে মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত ফাঁপা নীতিবোধের খোলস ছেড়ে করে ব্যবসার জটিল খেলার সমস্ত বিতর্কিত নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হয়। ছবিটির শেষে সোমনাথ রূপকার্থে একজন দালাল বা মিডলম্যানে পরিণত হয়, যখন সে ব্যবসায় লাভের আশায় বন্ধুর বোনকে (একজন যৌনকর্মী) কাজে লাগায়। *দ্য মিডলম্যান* ছবিটির মধ্যে দিয়ে রায়, "রাজনৈতিক" ও "দাম্পত্য" – এই দুই বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসেবে তাঁর নিরীক্ষণের সফর শেষ করেন। পরবর্তীকালের ছবিগুলিতে বিষয় হিসেবে সম্পর্কের আখ্যান থাকলেও, সেগুলিকে তিনি অন্য অবস্থান থেকে দেখেছেন।

আশ্চর্যজনকভাবে, ১৯৭৫ সালে *দিওয়ার* মুক্তি পায় এবং সে বছর থেকেই হিন্দি ছবিও দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। *দিওয়ার*কে এখন একটি কাল্ট ছবি হিসেবে দেখা হয় যা হিন্দি চলচ্চিত্রের অর্থহীন প্রতিকূলতা ও দুর্নীতির চাপে বিদ্রোহী ও ক্রুদ্ধ নায়কের পর্যায় বা অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান ফেজকে আহ্বান করেছিল। *দ্য অ্যাডভার্সারি* ছবির সিদ্ধার্থ, কিছুক্ষণের জন্য হলে্ নিজের অধিকারহীনতাকে মেনে নেয় এবং *দ্য মিডলম্যান* ছবিতে সোমনাথ শুধুমাত্র টিঁকে থাকার জন্য নীতিবোধের সঙ্গে আপস করে। রায়ের আখ্যানের এই শিষ্ট পুরুষরা *দিওয়ার* ও *ত্রিশুলের* (দ্য ট্রাইডেন্ট, ১৯৭৮) বিজয়, যারা আদতে ন্যায়বিচারের সন্ধানে একক ব্যক্তির এক সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে, তাদের থেকে বহুদূরের চরিত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আটচল্লিশ বছর পরে, অপু থেকে শুরু করে সোমনাথ পর্যন্ত, রায়ের "বিনম্র" কেন্দ্রীয় চরিত্ররা, তাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লড়াইয়ের মাঝে, অনেক বেশি স্তরান্বিত ও বোধগম্য।

নীলশ্রী বিশ্বাস একজন লেখক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা